সামনে এগোতে হলে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ঢাকা শহরে উটের বহর আগে কখনো দেখা যায়নি, ধিক্কৃত পাকিস্তান আমলেও নয়। উট ছিল, তবে থাকত তারা ছবি ও কবিতায়; কিন্তু তারা যখন দৃশ্যমান হয়ে উঠল আমাদের এই রাজধানীতে, তখনই উট দেখে নয়, উটের ভক্তদের দেখে খুবই পীড়িত হয়েছে সংবেদনশীল মানুষ। শামসুর রাহমানও হয়েছিলেন, যে জন্য তিনি কবিতা লিখে দুঃখে ও পীড়ার কথা জানিয়েছেন। কিন্তু কেন ও কেমন করে ঘটল এ অদ্ভুত উটভক্তি? ঘটেছে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে। সেটাই প্রথম সত্য।

এরশাদ মোটেই ধার্মিক, ধর্মভীরু ইত্যাদি ছিলেন না। কিন্তু ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার তিনি যতদূর সম্ভব করেছেন, ক্ষান্ত দেননি। সামরিক শাসন পাকিস্তান আমলেও এসেছে। আইয়ুব খানও একটানা ১০ বছর সামরিক বাহিনীর সাহায্যে দেশ শাসন করেছেন। কিন্তু তিনি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেননি, যেটা এরশাদ করেছেন। এ পার্থক্যের কারণ ছিল। আইয়ুব খানের মধ্যে এক ধরনের আধুনিকতা ছিল। যেজন্য তিনি যেমন শিল্পায়নে উদ্যোগ নিয়েছেন, তেমনি হাত দিয়েছেন মুসলিম পারিবারিক আইন সংস্কার এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে। এ কারণে মোল্লারা তার ওপর খুশি ছিল না, জামায়াতে ইসলামী তো রীতিমতো যুদ্ধই ঘোষণা করেছিল। আইয়ুব মোল্লাদের ছাড় দেননি। এরশাদ দিয়েছেন। তিনি রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তন করেন, পীরের আস্তানায় নিয়মিত যাতায়াত করেছেন; তার এক পীরের ওরস উপলক্ষেই তো উটের আগমন ঘটেছিল ঢাকা তথা বাংলাদেশে। আইয়ুব খানের ভেতর এক ধরনের আত্মবিশ্বাসও ছিল। যে জন্য তিনি অস্ত্রের ভাষায় কথা বলেছেন ঠিকই; কিন্তু ধর্মের ভাষাতে কথা বলেননি। এরশাদের মধ্যে সে আত্মবিশ্বাসটা একেবারেই ছিল না।

আত্মবিশ্বাস মোহাম্মদ আলী জিন্নাহরও ছিল। যেজন্য ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, পাকিস্তান হবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। জিন্নাহর পর যেসব রাজনীতিক এসেছেন তারা সংবিধান তৈরিতে সময় নিয়েছিলেন নয় বছর এবং রাষ্ট্রকে ঘোষণা করেছিলেন ইসলামী প্রজাতন্ত্র বলে। লক্ষণীয় যে, আইয়ুব খান রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নিয়ে যে সংবিধান জারি করেন তাতে রাষ্ট্রকে তিনি ইসলামী বলেননি, সাদামাটা প্রজাতন্ত্র বলেই শান্ত হয়েছেন। এরশাদ অবশ্য তার পূর্বসূরি জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের আত্মবিশ্বাসের অভাবের ঐতিহ্যের মধ্যেই ছিলেন। জিয়া মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন; কিন্তু ক্ষমতা লাভের পর ফরমান জারি করে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নির্বাসিতও করেছেন। শুধু তাই নয়, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের ওপর থেকে তিনি নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন। তাতে সুবিধা হয় জামায়াতওয়ালাদের। তারা তথাকথিত জাতীয়তাবাদীদের (বিএনপি এবং আওয়ামী উভয় ঘরানার) পিছু পিছু চলে, জাতীয়তাবাদীদের সহায়তা দিয়ে এবং তাদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে একসময় রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হয়ে পড়েছে, এমনকি পাকিস্তানের ২৩ বছরেও যা ছিল তাদের জন্য অকল্পনীয়। উটেরা আসবে না কেন, তারা তো আসবেই।

এরশাদের পর যে জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতায় এসেছে তারাও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করার ব্যাপারে আগ্রহের কোনো অভাব দেখায়নি। বরং উভয় দলই প্রায় প্রতিযোগিতামূলকভাবে লোকের ধর্মবোধ উস্কে দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছে। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ফিরিয়ে আনার আবশ্যকতা বিএনপির তো অনুভব করার কথাই নয়, তারা তো ক্রমে নব্য মুসলিম লীগেই পরিণত হয়েছে; মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বলে যারা নিজেদের মনে করে সেই আওয়ামী লীগও চুপচাপ থেকেছে, পাছে ভোট হারায়। ওদিকে সমাজে যে ইহজাগতিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা বেড়েছে তা মোটেই নয়। রাষ্ট্রক্ষমতা ওই চর্চাকে সরাসরি নিরুৎসাহিত করেছে। আর সমাজ তো রয়ে গেছে আগের মতোই। আমাদের দেশে রাষ্ট্রক্ষমতার হস্তান্তর ঘটেছে বটে; কিন্তু সমাজে কোনো বিপ্লব ঘটেনি। উল্টো সমাজ পিছিয়ে গেছে। রাষ্ট্র ট্রেনে না উঠে সওয়ার হতে চেয়েছে উটের পিঠে। আমরা পীড়িত হয়েছি, শাসকশ্রেণী হয়তোবা উপভোগ করেছে। মানুষ মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল; সে জন্য তারা যুদ্ধ করেছে। মুক্তি তো আসেইনি, বরং স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় হতাশ হয়ে মানুষ বসে পড়েছে।

ওদিকে বেড়েছে বৈষম্য; দারিদ্র্য কমেনি এবং বৈষম্য বেড়েছে, এ এক দুঃসহ পরিস্থিতি। এমন অবস্থায় মানুষ স্বভাবতই নেশাগ্রস্ত হয়, হয় আশ্রয়হীন। সমাজে দুটোই দেখা দিয়েছে। কাউকে পেয়েছে নেশায়, এদের কেউবা ড্রাগ সেবন করে, কেউ ছোটে পীর ও মোল্লার কাছে, সেও এক ধরনের নেশা বৈকি। ওদিক আশ্রয়হীন মানুষ কোথাও কোনো আশা দেখে না, ন্যায়বিচারের আলো পায় না। বিচ্ছিন্নতার বোধে তার পীড়া বাড়ে; সে তখন আশ্রয় খোঁজে ধর্মের কাছে। মৌলবাদ বিকাশের পেছন এ আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাটাকে যদি না দেখি তাহলে রোগটাকে বুঝতে পারব না, তার চিকিৎসার যে সুরাহা করব তা-ও সম্ভব হবে না। মনে রাখতে হবে, সন্ত্রাসের সঙ্গে বেকারত্ব প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বেকার যুবকরাই সন্ত্রাসী হয়, কেননা তাদের কাছে জীবনের কোনো মূল্য থাকে না। তারা অতি অল্প দামে বিক্রি হয়, খুব সহজে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ইসলামী জঙ্গিরা যে সংখ্যায় বাড়ছে তার পেছনে বেকারত্বের পৃষ্ঠপোষকতাটা ভয়ঙ্করভাবে কার্যকর। সমাজের পশ্চাৎপদতাটা আজকের নয়, বহুকালের পুরনো। কিন্তু কথা ছিল আমরা সামনে এগোব। পারলাম না। তার কারণ রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা গেল তারা সেটা চাইল না। তাদের আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্র ও দেশকে রাখবে নিজেদের কবজায়। লুণ্ঠন করবে বিনা বাধায়। লুণ্ঠনের লিপ্সাই তাদের পরস্পরবিরোধী শিবিরে ভাগ করে দিয়েছে, নইলে তারা একই– ওই লুণ্ঠনকারীই। যেন ডাকাতদের লড়াই, ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে। তারা ধর্মকে ব্যবহার করল ক্ষমতায় যাওয়ার অবলম্বন হিসেবে। এ কাজটা সহজ। ধর্মের বাণী সরল, তার প্রতিশ্রুতিও সরল। ধর্মের ভাষা সহজ এবং হৃদয়স্পর্শী; কেননা তা সমষ্টিগত নয়, ব্যক্তিগত লাভের কথা বলে, ভোগের উপায় জানিয়ে দেয়, প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে পরকালে সিদ্ধিপ্রাপ্তির। মানুষ আকৃষ্ট হয়।

বাংলাদেশে এখন যত মাদ্রাসা আছে পাকিস্তান আমলেও তা ছিল অকল্পনীয়। মাদ্রাসা যত বাড়ে বেকারত্বও তত বাড়ে, প্রায় সমানতালে। মাদ্রাসায় শিক্ষিত তরুণরা উৎপাদনে অংশ নিতে পারে না, কায়িক পরিশ্রমকে তারা হালাল নয় হারামই মনে করে, ভাবে এ হচ্ছে অপবিত্র; তদুপরি রয়েছে তাদের শিক্ষার অভিমান। অথচ ওই শিক্ষা তাদের যে ব্যবহারিক দক্ষতা দেয় তা-ও নয়। এখন দেখা যাচ্ছে, তারা বিএ, এমএর সঙ্গে সমান মর্যাদা দাবি করেছে। আদায়ও করে নিচ্ছে। পারছে নিতে। কেননা দেশের অতীত শাসকশ্রেণী তাদের তোয়াজ করতে ব্যস্ত থেকেছে, পাছে ভোট হারায়। মাদ্রাসা শিক্ষা কোনোভাবেই সাধারণ শিক্ষার সমমানের নয়। অথচ দুই শিক্ষাকে একই মানের বলে চালানো হচ্ছে। এর ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা জনপ্রিয় হবে, কেননা মাদ্রাসায় পাস করা তো বটেই, উচ্চ নম্বর পাওয়াও সহজ এবং মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতে খরচও পড়ে কম। নিচুমানের এবং অল্প খরচায় 'শিক্ষা'প্রাপ্তরা নম্বরের জোরে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের জব্দ করবে– এমন আশঙ্কা মোটেই অযৌক্তিক নয়। মনে হয় অচিরেই আমরা মাদ্রাসা শিক্ষার প্লাবন দেখতে পাব। তার ফলে এমনিতেই দুর্বল সাধারণ শিক্ষার দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পাবে। বলাবাহুল্য, এ প্লাবন যে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাকে স্পর্শ করতে পারবে তা নয়, কেননা ওই শিক্ষার দালানকোঠাগুলো একাধারে উঁচু ও শক্ত। মাদ্রাসা শিক্ষা সাধারণ শিক্ষাকে আক্রমণ করেছে এবং তাকে টেনে নামাচ্ছে– এ ঘটনা যখন দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠবে তখন ইংরেজি মাধ্যমের প্রতি অভিভাবকদেরও আগ্রহ বাড়বে; সাধারণ শিক্ষা যত নামবে ইংরেজি শিক্ষার আকর্ষণ ও দাপট ততই চড়া হবে, এটাই স্বাভাবিক। সেটাই ঘটতে যাচ্ছে। লোকে বাড়িঘর বিক্রি করে হলেও ছেলেমেয়েদের ইংরেজি বিদ্যালয়ে পাঠাতে চেষ্টা করবে। মাদ্রাসা শিক্ষার পেছনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাটা বড়ই পরিষ্কার। সরকারি দান-অনুদান ক্রমাগত বাড়ছে। সনদের স্বীকৃতিও দেওয়া হচ্ছে। সরকার বদল হয়; কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষাকে উৎসাহিত করার নীতিতে কোনো প্রকার ইতরবিশেষ ঘটে না। বরং এ ব্যাপারে সরকারগুলো একে অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। এর পেছনে ভোট পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা তো রয়েছেই, আরো একটি গোপন অভিপ্রায়ও কাজ করে। সেটা হলো গরিব মানুষকে গরিব করে রাখা।

তাছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগেও মাদ্রাসা খোলা হয় এবং হচ্ছেও। স্কুল খোলার চেয়ে মাদ্রাসা খোলা সহজ এবং লাভজনক। মাদ্রাসা খুলতে খরচ পড়ে কম। সরকারি অনুদান পাওয়া যায়। না পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই, ধর্মপ্রাণ মানুষ দান-খয়রাত করবে। কাজটা লাভজনকও বৈকি। একদিকে নয়, দু'দিকে। প্রথমত. মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতারা বড়মাপের ভালো মানুষ বলে খ্যাতি পায়। লোকটি আসলে হয়তো খাঁটি দুর্বৃত্ত; কিন্তু তার সে পরিচয়টা চাপা পড়ে যায় ধর্মপ্রাণতার লেবাসের অন্তরালে। সামাজিকভাবে এটি একটি ভালো বিনিয়োগ। দ্বিতীয়ত, এতে পুণ্য লাভও ঘটে। সেটা আরেক ধরনের বিনিয়োগ। তাই দেখা যায়, বিত্তবানরা মাদ্রাসার জন্য টাকা দেয়; কিন্তু স্কুলের ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় না। এমনকি অপেক্ষাকৃত কম টাকার মালিক যারা তারাও মনে মনে আশা রাখে, একটা মাদ্রাসা খুলবে। মাদ্রাসা শিক্ষা যে কত

ভয়ঙ্কর হতে পারে, পাকিস্তানের শাসকরা এখন তা অস্থিমজ্জাতে টের পাচ্ছে। একসময় মার্কিন অর্থে তারা মহোৎসাহে মাদ্রাসা খুলেছে, সেখানে জঙ্গিরা তৈরি হয়েছে। তালেবানরা ওইসব মাদ্রাসাতেই শিক্ষিত।

আফগানিস্তানে তারা ছিল, এখনো আছে, অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছে। তারা এখন শত্রু খোঁজে, কমিউনিস্টদের না পেয়ে খোদ মার্কিনিদেরই শত্রু মনে করছে। কমিউনিস্টরা শয়তান ছিল, কেননা তারা ছিল 'নাস্তিক', এখন মার্কিনিরা শত্রু হয়েছে। কেননা তারা হলো বিধর্মী। মার্কিনিদের বর্তমান নেতা সন্ত্রাসী শ্রেষ্ঠ জর্জ বুশ তাদের একদা মিত্র তালেবান-আল কায়দার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রতিক্রিয়ায় ইসলামী জঙ্গিরা নিজেদের মুসলমান পরিচয়টিকে উচ্চে তুলে ধরে বলেছে, তারা জিহাদে লিপ্ত রয়েছে। উভয়পক্ষের অবস্থানই ধর্মীয় মৌলবাদী। বুশের পক্ষে আফগানিস্তান, ইরাক, পারলে ইরান দখল করে নেওয়ার জন্য ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করা অনেক বেশি কার্যকর ছিল। আমেরিকা বিপন্ন, আমাদের খ্রিস্টান সভ্যতা হুমকির মুখে– এ ধরনের আওয়াজ অধিকতর উপযোগী অন্য দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন, আমাদেরও তাই যুদ্ধে যেতে হবে বলার তুলনায়। বুশ হচ্ছেন নব্য হিটলার। হিটলার ব্যবহার করেছিলেন বর্ণবাদী বিদ্বেষকে, তিনি কাজে লাগাচ্ছেন ধর্মীয় অহমিকাকে। আর পরিহাসের বিষয় এটাও যে, ইহুদিরা এক সময় হিটলারের বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হয়েছিল এখন তারাই মার্কিনিদের সাহায্য নিয়ে ফিলিস্তিনে আরবদের ওপর জুলুম চালাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীদের মহানায়ক জর্জ বুশ নিজেকে বলছেন খ্রিস্টান, তার আক্রমণে বিপন্নরা আত্মপরিচয় খুঁজতে গিয়ে নিজেদের বলছে মুসলমান। শোষক ও শোষিতের ঝগড়াটা তাই পরিণত হচ্ছে খ্রিস্টান-মুসলমান কলহে। আত্মপরিচয়ের এ প্রশ্নটা আমাদের এ অঞ্চলেও জরুরি হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ আমলে কেউ ছিল হিন্দু, কেউ মুসলমান; পাকিস্তান শাসনামলে আমরা নিজেদের চিনলাম বাঙালি বলে। কিন্তু দেখা গেল, ক্রমে বাঙালি পরিচয়ের চেয়ে সেই পরিত্যক্ত মুসলমান পরিচয়টিই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। লক্ষণটা কিন্তু একেবারে শুরুতেই দেখা দিয়েছিল। '৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে নতুন রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রেসকোর্সের বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি বলেছিলেন, আমরা হলাম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান রাষ্ট্র। সেই বলাটা কোনো আকস্মিক বিচ্যুতি ছিল না। তার নিজের ভেতরে এবং অনেকের ভেতরেই মুসলমান পরিচয়টি নিয়ে সুপ্ত একটা গর্ববোধ ছিল বৈকি। সুপ্তের ঘুম ভাঙা কি আর অস্বাভাবিক ঘটনা?

পরে বাঙালিত্ব নিয়ে গর্বটা কমেছে, কেননা বাঙালির নতুন রাষ্ট্র মানুষকে মুক্তি দেয়নি, যেভাবে দেওয়ার কথা ছিল; আর সে ফাঁকে মুসলমানত্বের অহমিকাটা নিজের জন্য জায়গা করে নিয়েছে। পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমান ওই মুসলমান পরিচয়টিকেই বড় করে তুলেছেন। প্রমাণ? সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিদায় করে দেওয়া। ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ যখন বাড়ে তখন সেটার জন্য প্রকাশের পথ থাকে দুটো। একটি ডানের, অন্যটি বামের। আমাদের শাসকরা বামপন্থাকেই সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে করে। যেজন্য আমরা দেখেছি যে, একাত্তরের পরে শেখ মুজিবুর রহমান মনুষ্য সভ্যতার এবং বাঙালির নিকৃষ্টতম শত্রু আল বদর-রাজাকারদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর ক্ষমতায় এসে জিয়া দেখেছেন তার প্রধান প্রতিপক্ষ হচ্ছে আওয়ামী লীগ, যার জন্য আওয়ামী লীগের রাজনীতির প্রধান ভিত্তি যে ধর্মনিরপেক্ষতা তাকে নির্মূল করার পদক্ষেপ নেন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলকে প্রকাশ্যে রাজনীতি করার অধিকার দেন; কিন্তু তিনিও জানতেন, তার প্রকৃত শত্রু যদি কেউ থাকে তবে তারা আওয়ামী লীগ নয়, বামপন্থিরাই। তাই বামপন্থি কর্নেল তাহেরকে ফাঁসির মঞ্চে উঠতে হয়েছে এবং রাজাকার আবদুল মান্নান মন্ত্রী হতে পেরেছেন। বামপন্থিদের ধ্বংস করার জন্য তিনি আরো একটি কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, সেটা হলো নানা প্রলোভন দেখিয়ে তাদের একাংশকে নিজের দলে টেনে নেওয়া। বামপন্থি ধারা শক্তিহীন হয়েছে, দক্ষিণপন্থিরা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, বর্ষাকালের খালের মতো; তবে তারা খাল থাকেনি, পরিণত হয়েছে নদীতে। জিয়া যে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন সেটাও ছিল স্বাভাবিক ঘটনা।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আরো একটি ঘটনা ঘটেছে যা দক্ষিণপন্থিদের সাহায্য করেছে। সেটা হলো তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতন। এর ফলে বিশ্বজুড়ে দক্ষিণপন্থিরা উল্লসিত এবং বামপন্থিরা বিষণ্ন হয়েছেন। তবে বাংলাদেশে যেমন প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে তেমনটা বিশ্বের অন্য কোথাও চোখে পড়েছে কি-না জানি না। বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল বামপন্থিদের সবচেয়ে পুরনো এবং সর্ববৃহৎ সংগঠন। তাদের একাংশ বলে বসল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, চেষ্টা করল নিজেদের বিলুপ্ত করে দিতে। বামদিকের পথ অবরুদ্ধ দেখে মানুষের বিক্ষোভ ডানদিকে মোড়

নিতে চাইল। তাতে সুবিধা হলো ডানের এবং ডানের শেষ মাথায় যাদের অবস্থান সেই জামায়াতে ইসলামীর। তারা ক্ষমতালোভের আশায় নাড়াচাড়া দিয়ে উঠল এবং ক্ষমতার অংশীদারও হলো।

বাস্তবতার চেহারাটা এ রকমেরই নির্মম। কিন্তু উপায় কি? প্রতিকার আসবে কোন পথে? বলাবাহুল্য, প্রতিকার শুধু সংস্কারে আসবে না। শাসকশ্রেণীর সবাই কমবেশি উটের সমর্থক। তফাতটা মাত্রার এবং সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির। ধর্ম ব্যবসায়ীরা রাজনীতিকদের সঙ্গে অতীতে তারা যুগপৎ আন্দোলন করেছে। পরে আরো কাছে টেনেও নিয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষতাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কোনো পক্ষেরই তেমন কোনো আগ্রহ নেই। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে গণতন্ত্রের একেবারে প্রথম শর্ত। ধর্মনিরপেক্ষতায় যারা আস্থা রাখেন না অথচ গণতন্ত্রের কথা বলেন তারা হয় অজ্ঞ নয়তো ভণ্ড। আমরা আমাদের পরিচয় দিতে চাই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে, মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে নয়। কিন্তু আমাদের শাসকশ্রেণী কি তা চায়? নিজেদের গণতন্ত্রের পথযাত্রী করতে হলে তাই যা করতে হবে তাহলো রাষ্ট্রের চরিত্রে পরিবর্তন আনা এবং সে সঙ্গে সমাজের মৌলিক পরিবর্তন। এ দুটি অত্যাবশ্যকীয় কাজের কোনোটিই সম্ভব হবে না, যদি না বিদ্যমান ব্যবস্থাকে পরাভূত করা না যায়। কিন্তু পরাভূত যে করব, সেটা কোন পথে? নির্বাচন? নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে ওই কর্তব্য পালন সম্ভব নয় সেটা তো অতীত অভিজ্ঞতাই আমাদের বলে দিচ্ছে। নির্বাচনের অর্থ হচ্ছে শাসকশ্রেণীর কোন অংশের হাতে আমরা লাঞ্ছিত ও শোষিত হবো সেটা ঠিক করা, তার বেশি নয়, কমও নয়। পথটা হলো আন্দোলনের। যে আন্দোলন আমরা অতীতে করেছি, এখন প্রয়োজন তাকে আরো সুসংহত করে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যাওয়া। নইলে আমরা কেবল আক্ষেপই করব, মুক্তি পাব না। এমনকি সামনে এগোতেই পারব না।

সৌজন্যঃ সমকাল